# রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘পোষ্য কোটা’ পুনর্বহাল বিতর্ক

শাহ মো. জিয়াউদ্দিন

: সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিশ্ব ইতিহাসে খুব কম দেশেই এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেখানে একটি প্রজন্ম বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের রাজনীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বাংলাদেশের কোটা বিরোধী আন্দোলন তেমনই এক বিরল অধ্যায়। এই আন্দোলন কেবল একটি প্রশাসনিক নীতি সংশোধনের দাবিতে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা ধীরে ধীরে রূপ নেয় শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের আন্দোলনে। এরই ধারাবাহিকতায় শেখ হাসিনার দীর্ঘ মেয়াদের সরকার শেষপর্যন্ত পদত্যাগে বাধ্য হয় এবং ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দেশত্যাগ করতে হয় তাকে।

এই দিনটি শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসেই নয়, গোটা উপমহাদেশের ইতিহাসেও এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এক গণঅভ্যুত্থান প্রমাণ করে দেয়—যদি কোনো প্রজন্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়, তবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তিকেও আত্মসমর্পণ করতে হয়।

কোটা সংস্কারের দাবিকে কেন্দ্র করে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নামে। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি চাকরিতে অতিরিক্ত কোটা ব্যবস্থা

বিদ্যমান ছিল, যা মেধাভিত্তিক নিয়োগের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও পোষ্য কোটা ইস্যু ছাত্রসমাজের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে।

২৪ জুলাইয়ের আন্দোলনে ছাত্রজনতা একত্রিত হয়েছিল মূলত সব ধরনের বৈষম্যমূলক কোটা বাতিলের দাবিতে। এই আন্দোলনে লাখো শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ যোগ দেন। আন্দোলন চরমে পৌঁছালে সেটি কেবল কোটা সংস্কারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণআন্দোলনে পরিণত হয়।

৫ আগস্ট আন্দোলনের চরম মুহূর্তে শেখ হাসিনা দেশত্যাগ করেন। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন মোড়। ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে শুরু হওয়া একটি আন্দোলন কেবল একটি সরকারের পতনই ঘটায়নি, বরং রাষ্ট্রীয় রাজনীতির চরিত্রকেই পাল্টে দিয়েছে।

কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় হলো, যে আন্দোলনের মূল দাবি ছিল সব ধরনের কোটা বাতিল করাÑঠিক সেই সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও পোষ্য কোটা পুনর্বহালের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

২০২৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি উপকমিটির সভায় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ১০ দফা শর্তে পোষ্য কোটা ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তে বলা হয়Ñ কেবল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ঔরসজাত সন্তান এই সুবিধা পাবেন। প্রাথমিক আবেদন করতে হলে বিজ্ঞাপিত যোগ্যতা ও শর্ত প্রযোজ্য হবে। নির্ধারিত আসনের বাইরে অতিরিক্ত হিসেবে এ ভর্তি বিবেচনা করা হবে। ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী মেধা অনুসরণ করা হবে। আবেদনকারীর অবশ্যই ন্যূনতম পাস নম্বর থাকতে হবে। কোনো বিভাগে দুই জনের বেশি ভর্তি করা যাবে না। অভিভাবকের কর্মরত বিভাগে সন্তানকে ভর্তি করানো যাবে না। অটো মাইগ্রেশন ছাড়া বিভাগ পরিবর্তনের সুযোগ থাকবে না। অভিভাবকের অনিয়ম প্রমাণিত হলে ছাত্রত্ব বাতিল করা হবে এবং অভিভাবকের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই কোটা সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীরা আবাসিক হলে আবেদন করতে পারবে না।

শর্ত জুড়ে দেওয়া হলেও মূল বিষয়টি স্পষ্টÑবিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আসলে বৈষম্যের এক নতুন দরজা খুলে দিচ্ছে।

এখানে প্রশ্ন জাগে, জানুয়ারি মাসে উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তার যখন ঘোষণা দিয়েছিলেনÑ“আমি ১ শতাংশ পোষ্য কোটা রাখার পক্ষেও নই। ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষেই এটি বাতিল করা হবে”Ñতখন হঠাৎ করে কেন সেপ্টেম্বর মাসে সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীনের সভাপতিত্বে ভর্তি কমিটির সভায় কোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো?

এটি কেবল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং ছাত্রসমাজের সঙ্গে শিক্ষকদের দ্বিচারিতার একটি নগ্ন রূপ। শিক্ষকেরা জাতি গঠনের কারিগর। তাঁদের দ্বিধান্বিত অবস্থান শিক্ষার্থীদের হতাশ করে এবং প্রজন্মকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেয়।

কোটা পুনর্বহালের ঘোষণার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা আবারও আন্দোলনে ফেটে পড়ে। ১৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

২০ সেপ্টেম্বর বিকেলে সহ-উপাচার্য মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীনের গাড়ি শিক্ষার্থীরা আটকে প্রতীকী ভিক্ষার আয়োজন করেন। তাঁকে গাড়ি থেকে নামতে বাধ্য করা হয় এবং বাসভবনের ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা ভেতরে আটকা পড়েন।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মুখোমুখি সংঘর্ষ কোনোভাবেই কাম্য নয়। কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছেন মূলত শিক্ষক সমাজের একাংশ, যারা পোষ্য

কোটার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

২০ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধের ঘোষণা দেয়। একই সঙ্গে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

এখানে প্রশ্ন হলোÑ যেখানে শিক্ষার্থীরা সমান সুযোগ-সুবিধার দাবিতে আন্দোলন করছে, সেখানে শিক্ষক সমাজ কেন বৈষম্য টিকিয়ে রাখতে চাইছেন?

বাংলাদেশে কোটা ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তানদের বিশেষ সুবিধা দিতে। একসময় তা ছিল সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এটি পরিণত হয় বৈষম্যের এক কাঠামোয়।

যখন একজন যোগ্য শিক্ষার্থী শুধুমাত্র কোটার কারণে সুযোগ হারায়, তখন তা কেবল একজনের ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়; বরং জাতীয় সম্পদের অপচয়। কারণ মেধাবী শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র পরিচালনায় সবচেয়ে যোগ্য।

২৪ জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের শিক্ষা হলোÑযে কোনো ধরনের বৈষম্য শেষ পর্যন্ত সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য ন্যায্য দাবি তুলেছিল, যা শেষ পর্যন্ত জাতির বৃহত্তর মুক্তির আন্দোলনে রূপ নেয়।

অতএব, কোনোভাবেই পোষ্য কোটার মতো বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা যায় না।

শিক্ষক সমাজ যদি বৈষম্য টিকিয়ে রাখেন, তবে তাঁরা জাতি গঠনের কারিগর নন, বরং বৈষম্যের রক্ষক হয়ে দাঁড়ান। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংঘর্ষ কোনো সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের দাবি শোনার মানসিকতা গড়ে তোলা।

পোষ্য কোটা চিরতরে বাতিল করতে হবে। কোনো শর্তে এই কোটা ফিরিয়ে আনা যাবে না। ভর্তি ও চাকরিতে কেবল মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই নির্বাচন হতে হবে। শিক্ষকদের উচিত জাতির প্রতি দায়বদ্ধ থেকে বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়ার উদ্যোগ নেওয়া। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সরকারকে কোটা নিয়ে সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ নিয়ে আর বিতর্ক না থাকে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে কোটা বিরোধী আন্দোলন এক অনন্য অধ্যায়। এই আন্দোলন শুধু একটি প্রশাসনিক নীতি পরিবর্তনের দাবি ছিল না; বরং এটি বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়ার শপথ। শেখ হাসিনার পতন এই আন্দোলনের সরাসরি ফল।

কিন্তু বিস্ময়করভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত সেই আন্দোলনের মূল লক্ষ্যকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। শিক্ষকেরা যদি বৈষম্যের পক্ষে দাঁড়ান, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কোন দিকনির্দেশনা পাবে?

বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানের মূল শিক্ষা হলোÑসমাজে কোনো ধরনের বৈষম্য বরদাশত করা হবে না। তাই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করাই এখন সময়ের দাবি।

[লেখক: উন্নয়নকর্মী]